বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রের গতিমুখ : সূচনাকাল

ফিরোজ আহমেদ

বাংলাদেশের সংবিধান বিষয়ক লেখা বেশির ভাগ রচনা পড়লে ধারণা হবে, ১৯৭২ সালের আদি সংবিধান থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই হয়তো বাংলাদেশের বর্তমান নিয়তি। কিন্তু '৭২ এর সংবিধানের রচনা প্রক্রিয়ার মাঝেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভেতর একদিকে দেখা যায় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশের ধারাবাহিকতা, অন্যদিকে চিহ্নিত করা যায় পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহেরও মূলবীজ। সে কারণেই ১৯৭২ এর সংবিধান, এটা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদ, এই সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া, গণপরিষদের বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন। এ প্রবন্ধ সেই অনুসন্ধানেরই অংশ।

স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণয়নে প্রথম সরকারি পদক্ষেপ হলো ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ জারি করা বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ।[১] গণপরিষদ আদেশ অনুযায়ী গঠিত সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত সংবিধানসভার (বাংলাদেশে যেটির নামকরণ হয়েছিল গণপরিষদ) গঠন ও কার্যপ্রণালী নিয়ে সংগত কারণেই দুটি বিতর্ক উঠেছিল। একটি হলো গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার ভিত্তি, অপরটি হলো সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই জনপ্রতিনিধিদের গণপরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারহীনতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গণপরিষদের অধিকারহীনতা। প্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিল আওয়ামী লীগ বাদে বাকি প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল আওয়ামী লীগেরই অভ্যন্তরে। অর্থাৎ প্রথমটি গণপরিষদের বাইরে থেকে ওঠা বিতর্ক, দ্বিতীয়টি গণপরিষদের ভেতরে।

সংগত কারণেই দুটি বিতর্ক উঠেছিল। একটি হলো গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার ভিত্তি, অপরটি হলো সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই জনপ্রতিনিধিদের গণপরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারহীনতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গণপরিষদের অধিকারহীনতা।

গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা: তৎকালীন বিতর্ক

দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র অল্প কয়েক দিন পরই ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ আওয়ামী লীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনের বিবৃতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে জনগণের পূর্ববর্তী ম্যান্ডেট অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেন– 'জনগণের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করা উচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোন সরকার দেশে গুরুতর অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণ হইতে পারে' (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

আওয়ামী লীগের তরফ থেকে এই বিবৃতির প্রয়োজন পড়েছিল, কারণ সংবিধান প্রণয়নকারী সভাটি কিভাবে গঠিত হবে, সেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন ও প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া শুরু হয়েছিল। কে এম ওবায়দুর রহমানের এই সংবাদ সম্মেলনের ঠিক দুই দিন আগেই ২১ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়, এবং এরই সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়ায় কে এম ওবায়দুর রহমান পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করেন। ওই সংবাদ সম্মেলনে ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ গুরুতর সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'আরেকটি সাধারণ নির্বাচন না করে বাংলাদেশের জন্য কোনো স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করা যেতে পারে না।' তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধকালে দেশে একটা গুণগত পরিবর্তন সাধন হয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের মতামত যাচাই ও বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে অপর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অপরিহার্য (দ্যা অবজারভার, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২)।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেও এই বিতর্কটি উঠেছিল। সংবিধান প্রণয়নের জন্য নতুন নির্বাচন দেওয়া উচিত– এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে মোজফফর সাহেবের এই মতামতের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন:

> *মাত্র এক বৎসর পূর্বে আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিলে, আমরা তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন নির্বাচনী এলাকাতেই তাঁহাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত আছি। শীঘ্রই কতকগুলি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহারা উক্ত সকল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি নিশ্চিত, তাঁহাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে* (ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২)।

উল্লেখ্য যে, এই প্রতিশ্রুত উপনির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এভাবে 'মাত্র এক বৎসর পূর্বে নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে কার্যত মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের মধ্য দিয়ে গোটা জাতির রাজনৈতিক চেতনার যে বিকাশটি ঘটেছিল, তাকে পাশ কাটানো হয়। নতুন নির্বাচনের যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল 'মাত্র এই এক বছর' সময়ের মাঝেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা আর রাজনৈতিক চেতনার যে উচ্চতর বিকাশ ঘটেছিল, তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য।

অল্প কিছুদিন পরই ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দুই প্রাক্তন প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ বলেন:

> *পরিষদ-সদস্যের শতকরা নব্বই জনই যেখানে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাথে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময়টুকু ভারতে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সেইসব*

গণপরিষদ-সদস্যের আদৌ আছে বলে দেশবাসী মনে করেন না (দৈনিক গণকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ১৯৭২)।

তাঁরা আরো একটা প্রশ্ন তোলেন, সেটা হলো, 'প্রায় ৫০ জনের অধিক গণপরিষদের সদস্যের (যাঁহারা দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত, অনুপস্থিত এবং পদত্যাগী) অবর্তমানে, অর্থাৎ বাংলাদেশের এক কোটির বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।' সদ্য দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান 'শীঘ্রই কতকগুলি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার' প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং সেখানে বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও এই উপ-নির্বাচনগুলো যে আদৌ আর আয়োজন করা হয়নি, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বক্তব্যে।

সংবিধান বিষয়ে তখনকার আরেকটি প্রভাবশালী দল মওলানা ভাসানীর ন্যাপও প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করেছিল। এই দলটি 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান দিয়ে ১৯৭০ সালের সেই সাধারণ নির্বাচন বর্জন করে। অবশ্য মওলানা ভাসানী এবং তাঁর গোত্রভুক্ত অনেকেরই রাজনৈতিক তৎপরতা বেশ আগে থেকেই স্বাধীন পূর্ব বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। শুরুর দিকে গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের বৈধতা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেননি, এবং নতুন সরকার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ প্রকাশিত ন্যাপের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হক কথা'য় 'সংবিধান প্রণয়ন করিবে কাহারা' শীর্ষক নিবন্ধটিতে ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী হওয়া ব্যক্তিদের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা তোলা হয়।

অচিরেই অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হতে যাওয়া জাসদ গঠনকারী নেতৃবৃন্দও গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন।

পরবর্তীতে 'হক কথা'র ১৪ জুলাই সংখ্যাটিতে আরো স্পষ্ট অবস্থান দেখা যায়, 'গণপরিষদের আইনি ভিত্তি কোথায়' শীর্ষক নিবন্ধটিতে বলা হয়:

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পাঁচ দফা শর্ত মেনে এই সদস্যরা নির্বাচনে গিয়েছিল। সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল, তৎসহ নির্বাচিত হয়েছিল প্রাদেশিক পরিষদ।...পাকিস্তান কায়েম থাকাকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুই সময়ের ব্যবধান মাত্র ৯ মাস হলেও রাজনৈতিক সচেতনতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যদানের দিক দিয়ে জনগণ অনেক এগিয়ে গেছে ('হক কথা'র সবগুলো উদ্ধৃতি আবু সালেক সম্পাদিত সাপ্তাহিক হক কথা সমগ্র থেকে গৃহীত)।

এরপর গণপরিষদ খসড়া সংবিধান উত্থাপন করলে মওলানা ভাসানী ও তাঁর রাজনৈতিক দল ন্যাপ (ভাসানী)-এর বিভিন্ন ধারার তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে আবারও সরাসরি প্রশ্ন তুললেন। ২০ অক্টোবর মওলানা ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় আবার বলেন:

বর্তমান গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারের আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত সদস্যগণ ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট পাইয়াছিলেন। সুতরাং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তাঁহাদের কোন অধিকার নাই (দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর ১৯৭২)।

ভাসানীর রাজনৈতিক বলয় থেকে শুরুতে আওয়ামী লীগের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে মৃদুস্বরে সমালোচনা করলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করলেও গণপরিষদ সদস্যদের দেশব্যাপী নিপীড়ন, ত্রাণসামগ্রী চুরি, সম্পত্তি দখল, দুর্নীতিসহ নানা অপরাধমূলক তৎপরতার অজস্র সংবাদ প্রচারিত হওয়া শুরু হলে অচিরেই গণপরিষদের এই সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের নৈতিক অধিকারটি জনমনেও গুরুত্ব পেতে শুরু করে।[২]

ন্যাপের দুই অংশ থেকে বৈধতার প্রশ্নটিকে দুটি দিক থেকে উত্থাপন করা হয়। মোজাফফর সাহেব স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতনার যে বিকাশ ঘটেছে, তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য নতুন করে গণপরিষদের নির্বাচনের অনুরোধ করেন। অন্যদিকে ভাসানী এই গণপরিষদ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, সেই দিকটি তুলে ধরেন। উভয় বক্তব্যেরই মূল সুর একই– স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদটি স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করেন না।

মস্কোপন্থী ধারা বলে পরিচিত মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এই বৈধতার প্রশ্ন একেবারে শুরুতেই উত্থাপন করলেও পরবর্তীতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁদের প্রতিনিধি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অংশগ্রহণ করেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি– এই মতামত ব্যক্ত করে গণপরিষদের একমাত্র সদস্য হিসেবে গৃহীত সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চীনপন্থী ধারা বলে পরিচিত প্রায় সকলে সম্মিলিতভাবে এই বৈধতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। এঁদের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর আওতায় জনগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে দিয়েছিল। মওলানা ভাসানীসহ অনেকেই সেই নির্বাচনকে বয়কটও করেছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক দাবি ছিল পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা, জনগণের মুক্তির সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষার যে বিকাশ ঘটল, সেটিকে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদ ধারণ করতে পারে না। ন্যাপ ভাসানীর মতো প্রভাবশালী বহু রাজনৈতিক দল ওই নির্বাচনে আদৌ অংশ নেয়নি। ফলে নতুন সংবিধান পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়াটা তাঁদের বিবেচনায় ছিল ন্যায়সংগত একটি দাবি। অচিরেই অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হতে যাওয়া জাসদ গঠনকারী নেতৃবৃন্দও গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন।

অর্থাৎ গণপরিষদের বৈধতার এই গুরুতর প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য বেশ কটি মহল থেকেই উঠেছিল। ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় সংবিধান সভার সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ আমলে অনুষ্ঠিত হওয়া শেষ নির্বাচনে বিজয়ীরাই দায়িত্ব পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবিধান প্রণয়নের জন্যই জনগণ সেই নির্বাচনে তাঁদের ভোট দিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের অধীনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ীরা দুটি পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠন করেন। তাঁদের বৈধতার উৎস ছিল এই যে ওই নির্বাচনে নির্বাচিতগণ অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জনরায় (ম্যান্ডেট)

গ্রহণ করেছিলেন। নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবেও এ দুই সংস্থাই কার্যকর ছিল। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে সংবিধান পরিষদ কিন্তু সংবিধান সভা ও আইনসভার দ্বিবিধ ভূমিকাই পালন করে। মন্ত্রিসভার ওপর এর কর্তৃত্ব ছিল, মন্ত্রিসভা সংবিধান পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। পরিষদের অনুমতি ছাড়া সরকার কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারত না, কোনো নতুন করও আরোপ করতে পারত না। এ দেশ দুটিতে শাসকের পরিবর্তন কোনো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়নি, বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা আইনি ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয়েছিল। ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে 'আইনি' কিংবা 'নৈতিক' বৈধতার অভাব তাঁদের ছিল না, সেই প্রশ্ন ওঠেওনি।

কিন্তু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন চেতনাগত উত্তরণের সুবাদে সেই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা সংগত কারণেই ছিন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাংগঠনিকভাবে বহুধাবিভক্ত পিকিংপন্থী বা চীনপন্থী বা মাওবাদী বলে পরিচিত দল-উপদলসমূহ[৩] এবং আওয়ামী লীগ ভেঙে বেরিয়ে আসা সদ্যোজাত জাসদ ঠিক এই প্রশ্নে কোনো মাঠের আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। এমনকি ঘটনাপ্রবাহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকাশ হিসেবে আবির্ভূত জাসদের সাথে সরকারবিরোধী অন্য বামদলগুলোর তেমন কোনো কর্মসূচিগত ঐক্য সংবিধান বা অপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে ন্যাপ মোজাফফর গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে শুরুতে প্রশ্ন তুললেও দ্রুতই তারা তাদের নির্ধারক রাজনৈতিক মিত্র আওয়ামী লীগের অস্বস্তি উপলব্ধি করে প্রশ্নটিকে পাশ কাটায়। শুরুতে এই বৈধতার প্রশ্নটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উত্থাপন করলেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোনো কথাই তারা তোলেনি। ফলে বৈধতার প্রশ্নটির আইনি-রাজনৈতিক গুরুত্ব যতই বিপুল হোক না কেন, আওয়ামী লীগ এই প্রশ্নটিকে আমলে না এনেই রাষ্ট্রক্ষমতার জোরে প্রায় অনায়াসে একে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

সংবিধান প্রণয়ন পর্বে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কটি ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবিধির সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি।

গণপরিষদের এখতিয়ার: ভেতরের বিতর্ক

অন্যদিকে যে গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়, স্বয়ং সেই গণপরিষদের নিজস্ব এখতিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কত সামান্য ছিল, সেই প্রশ্নটিই অতিসামান্য পরিমাণে হলেও অস্বস্তির জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। কেননা মুক্তিযুদ্ধের অবসানে প্রবল প্রতাপশালীরূপে আবির্ভূত আওয়ামী লীগের মধ্যেই বহুমুখী অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস ছিল সেই বিতর্কে।

সংবিধান প্রণয়ন পর্বে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কটি ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবিধির সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি। আগের পর্বে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগের বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের মাঝে তরুণতর একটা অংশের মাঝে জন্ম নেওয়া 'বিপ্লবাত্মক' চিন্তাও আওয়ামী রাজনীতির সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) আকারেই প্রশ্নটি উত্থাপন করে। কিন্তু গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নী সভা হিসেবে যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ আওয়ামী লীগ ও গণপরিষদের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল, তাঁদের অনেকের জন্যও অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল গণপরিষদের এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি। অকার্যকর একটি গণপরিষদ যাঁদের ভেতর অস্বস্তি, অসন্তুষ্টি কিংবা ভিন্ন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল, তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগের রাজনীতিরই অভ্যন্তরস্থ পক্ষসমূহ।

ঘটনাপ্রবাহ যতই অগ্রসর হতে থাকে, আওয়ামী লীগের বাইরের শক্তিগুলো যেমন অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চার করতে থাকে, ভেতরের স্বার্থগুলোও বেশ কটি ধারায় দানা বাঁধে। বাহাত্তর সালের পত্রপত্রিকার দিকে চোখ বোলালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বড় অংশের বেপরোয়া লুণ্ঠনজনিত রাষ্ট্র ও সমাজের নৈরাজ্যের আংশিক চিত্রটি যেমন পাওয়া যাবে, রাজনৈতিক কর্মসূচির উত্তরোত্তর তীব্রতা বৃদ্ধি থেকে অন্য দলগুলোর দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ও উপলব্ধ হবে। সংবিধান প্রণয়নের স্বল্পায়ু কালপর্বটিতে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার জোর এবং সেই সাথে বাস্তব রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি দিয়ে দলের বাইরের বিরোধিতা অতিক্রম করতে পেরেছিল। আওয়ামী লীগের ভেতরের প্রশ্নগুলো কিন্তু দলটির কিংবদন্তি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্বের সামনে ঠিকমতো পরিস্ফুটই হতে সক্ষম হয়নি, সেগুলো আভাসমাত্র দিয়েই তাৎক্ষণিক মিলিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ ভিন্ন চিন্তা ও মতগুলো শেখ মুজিবকে কার্যকর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি করতেই সক্ষম হয়নি।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান এবং ১০ তারিখ বাংলাদেশে আসেন। ওই দিনই ইতিপূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রপতি ধরনের শাসনের বদলে ওয়েস্টমিনস্টার ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। এর পরই সংবিধান সভা হিসেবে মনোনীত গণপরিষদকে তিনি দুইভাবে ক্ষমতাহীন করেন–প্রথমত, আর সব গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান প্রণয়নী সভার হাতে রাষ্ট্রের প্রায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলেও গণপরিষদকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়; দ্বিতীয়ত, গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আইন করে রুদ্ধ করা হয়।

ব্যারিস্টার আবদুল হালিম এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির যে বৈঠকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান 'রাষ্ট্রপতি ধরনের সরকার' থেকে 'প্রধানমন্ত্রী ধরনের সরকার' প্রতিষ্ঠায় তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন, ওই একই বৈঠকে তিনি জানান যে সংবিধান পরিষদকে আইন প্রণয়নী কিংবা মন্ত্রিসভার কাজকর্ম তদারকির কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হবে না। শেখ মুজিবুর রহমানের দেবতুল্য জনপ্রিয়তার মুখে কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি, কেবলমাত্র আমীর-উল ইসলাম 'অনভিজ্ঞতাহেতু' আপত্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ-এর খসড়া প্রণয়নের আগেই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা অবশ্যই আহ্বান করা উচিত, আর গণপরিষদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না দেওয়াটাও চরম অগণতান্ত্রিক হবে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে তিরস্কার করে থামিয়ে দেন। [ভাষ্যটা হালিম সাহেবের 'মেকিং দ্য কনস্টিটিউশন

অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে এ রকম–'অ্যাট দিস সাজেশন শেখ মুজিব স্টপড হিম (আমীর-উল ইসলাম) বাই সেয়িং : ইউ আর অ্যান ইনএক্সপেরিয়েন্সড ইয়াং ম্যান। হোয়াট নলেজ ডু ইউ কিপ অ্যাবাউট স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন?'] হালিম সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী আমির সাহেব ঐ বৈঠকে নিজেকে 'স্টুপিড' হিসেবে আবিষ্কার করলেন, 'এক্সপিরিয়েন্সড' ব্যক্তিরা কেউ তাঁর সমর্থনে কিছু বলার সাহস পেলেন না।[৪]

সংবিধান পরিষদ যে অস্থায়ী সংসদ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনসমূহ প্রণয়নের দায়িত্বটি পাবে না, সেটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের একটা ইঙ্গিতও এখানে পাওয়া যাবে। সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে রাষ্ট্রটি পরিচালিত হওয়ার সাথেও এর ভবিষ্যৎ নিয়তির একটা গুরুতর সম্পর্ক রয়েছে। আদতে এই কয়েক মাসের ক্ষমতার চর্চার ধরনই পরবর্তীকালের বাংলাদেশে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছে, এবং সেদিক থেকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচর্চার সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে আজও।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই গণপরিষদের কোনো আইন প্রণয়নী ক্ষমতা ছিল না, মন্ত্রিসভার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ছিল না সরকারের ব্যয়ের ওপরও কোনো তদারকির ক্ষমতা। ফলে যে বিপুলবিস্তারী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির লুণ্ঠন, অপব্যয় এবং তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে বেপরোয়া ব্যবহার বন্ধ করার কোনো আইনি ব্যবস্থা কিংবা জবাবদিহি আদায়ের উপায় প্রথম থেকেই ছিল না। ১৯৭২ সালের ওই সময়েই সাপ্তাহিক 'হক কথা'য় তুলনামূলক কম দামে ইউরোপীয় নতুন জাহাজ না কিনে কিভাবে পুরনো ভারতীয় জাহাজ কিনে রাষ্ট্রীয় অর্থের লোপাট করা হচ্ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যাবে, এবং এ জাতীয় অজস্র ঘটনা ঘটছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানার যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল ক্রয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রির পারমিট থেকে শুরু করে লাইসেন্স, ঠিকাদারি–সকল কাজেই রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপক লুণ্ঠন পাকিস্তান আমলের চেয়েও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব তদারক করার মতো কোনো ব্যবস্থা প্রথম থেকেই করা হয়নি। প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে এই কাজটি সংসদই করে থাকে, এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণ সম্পূর্ণতই আমলাদের হাতে।

> সংবিধান প্রণয়নের স্বল্পায়ু কালপর্বটিতে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার জোর এবং সেই সাথে বাস্তব রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি দিয়ে দলের বাইরের বিরোধিতা অতিক্রম করতে পেরেছিল।

এছাড়া সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল এককভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর, যিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারতেন না। এভাবে গণপরিষদ কার্যত রাষ্ট্রপতির (এবং রাষ্ট্রপতি আইনত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই সকল কাজ পরিচালনা করতেন বলে প্রধানমন্ত্রীর) অধীনস্থ হলো এবং সরকারের জবাবদিহি চাওয়ার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান আর অবশিষ্ট থাকল না।

গণপরিষদকে কোনো রকম সার্বভৌম ক্ষমতা না দেওয়ার পেছনে জনপ্রিয় যে যুক্তিগুলো দেওয়া হয়, সেটা হলো সংবিধান প্রণয়নে পাকিস্তানের ৯ বছর লেগে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সংবিধান পরিষদকে আর সব দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, যাতে বিলম্ব ছাড়াই দায়িত্বটি পালন করা যেতে পারে। বহুবিধ কারণে এই অজুহাত ধোপে টেকে না, যেমনঃ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়নে একটি বড় আপদ ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ। সংবিধান প্রণেতাদের জন্য এমন একটা ইসলামি সংবিধান প্রণয়ন করাটা জটিলতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, যেটা আবার পরস্পরবিরোধী বৈচিত্র্যপূর্ণ কতগুলো জাতি, পক্ষ ও গোষ্ঠীর স্বার্থের সমন্বয়ও ঘটাবে। আরো বেশি সময় লেগেছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হবে, সেটি নির্ধারণ করতে। এরপর ছিল ভাষা বিতর্ক, স্থানীয় পরিষদ আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বন্টন কিভাবে ঘটবে– এইসব ঝামেলা। এবং শেষত সংবিধান প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া অবস্থায় গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতায় এটাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন রীতিমতো বিপদগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ সকল দিক দিয়েই এই দ্বন্দ্ব ও জটিলতাগুলো থেকে মুক্ত ছিল।

ফলে এই যুক্তি এখানে অবান্তর যে অতিদ্রুত একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্যই গণপরিষদকে আর কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এটা আসলে দায়িত্ব না প্রদান করা বা গণপরিষদের কাজের বোঝা কমিয়ে দেওয়া নয়; এটা কার্যত ছিল গণপরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করা, তার এখতিয়ারকে সমূলে বিনষ্ট করা। নিজ দলের ভেতরে যে অবিশ্বাস এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতির কারণে পরিস্থিতির বিকাশের ওপর তার আস্থার ঘাটতি থেকেই এটা করা হয়েছিল (এ বিষয়ে ৪ সংখ্যক পাদটীকা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)।

গণপরিষদের ভেতরে থাকা সদস্যরা কেউ কেউ গণপরিষদের হাতে এই ক্ষমতা প্রদানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন বটে, তাঁরাও ব্যরিস্টার আমীরের মতোই নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। নিয়তির বড় পরিহাস, নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিকে উড়িয়ে দেওয়া কে এম ওবায়দুর রহমানই গণপরিষদকে কেন নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হবে না– এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন পরিষদের দ্বিতীয় সভায়। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

জনাব স্পীকার : আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবে।

জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান : মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই পরিষদের সদস্যগণ জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল। কিন্তু মন্ত্রিসভা এই পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল নন। ইহা গণতন্ত্রপরিপন্থী। মাননীয় স্পিকার সাহেব, বঙ্গবন্ধু সব সময়ই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আমরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৪৭ সালে ভারতে নেহরু সরকার ভারতীয় গণপরিষদের নিকট দায়িত্বশীল ছিল। পাকিস্তানের লিয়াকত আলী সরকারও তৎকালীন পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল ছিল। ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারের গণপরিষদ জাতীয় পরিষদেরও দায়িত্ব পালন করেছিল। এই পরিষদ যদি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়, তাহলে মন্ত্রিসভার ক্ষমতার উৎস কোথায়!

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে এই গণপরিষদকে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম পার্লামেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

আগে উল্লেখ করা আমীর-উল ইসলামের গল্পের সাথে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায়, গণপরিষদকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ তদারকি ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য ওবায়দুর রহমানের এই প্রস্তাব শেখ মুজিবুর রহমানের ক্রোধের উদ্রেক করবে। ঘটলও ঠিক তা-ই। গণপরিষদের বিবরণীর ঠিক পরবর্তী অংশেই আমরা পাই:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ *মেম্বারদের আরেকটা বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে চাই।*

স্পিকার যখন কথা বলেন, তখন আর কোনো মেম্বারের অধিকার নাই কথা বলার। বললে আপনি মেহেরবানি করে তাঁকে পরিষদ থেকে বের করে দিতে পারেন (গণপরিষদের পরিষদ বিতর্ক, বাংলাদেশ গণপরিষদ, মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ১৯৭২)।

ওই শেষ। এই হুঁশিয়ারির পর আওয়ামী লীগের আর কোনো সদস্য গণপরিষদের হাতে সার্বভৌম সংসদের ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কখনও আর তোলেননি।

গণপরিষদকে অকার্যকর করার এই কায়দাটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগ শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের মন্ত্রগুণের ওপরই নির্ভর করেনি, তার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তও আগে আগেই তৈরি ছিল। সেটি ২২ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ, [কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (সিসেশন অব মেম্বারশিপ) অর্ডার (পিও নং ২৩ অব ১৯৭২)]। বাংলাদেশের ইতিহাসের এটি অন্যতম গণতান্ত্রিক চেতনাবিরোধী আইন। রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশবলে প্রণীত বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ আইনটির অনুচ্ছেদ অনুযায়ী–

৩। (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া এবং উক্ত দলের সদস্যপদ লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া তিনি যদি–

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন; অথবা

(খ) উক্ত দল হইতে বহিষ্কৃত হন;
তাহা হইলে তাঁহার মেয়াদকালের অসমাপ্ত সময়ের জন্য তিনি আর পরিষদ সদস্য পদে থাকিবেন না। আইনটির ৫ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। এই আদেশের অধীনে প্রণীত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না।'

আদতে এই কয়েক মাসের ক্ষমতার চর্চার ধরনই পরবর্তীকালের বাংলাদেশে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছে, এবং সেদিক থেকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচর্চার সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে আজও।

ফলে রাষ্ট্রপতির একক ক্ষমতাবলে প্রণীত এই আইনের জোরে এভাবেই যে সংবিধান প্রণয়নকারী সভার হাতে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার কথা, যে পরিষদের কাছে সকলের জবাবদিহি করার কথা, সেই পরিষদ সদস্যদের চূড়ান্তরূপে নির্বিষ সাপে কিংবা দলীয় দাসে পরিণত করা হয়।

গণপরিষদকে সংসদের ক্ষমতা না দিয়ে বরং অনেক নির্বাহী আদেশেই তখন দেশ পরিচালিত হচ্ছিল, এবং নির্বাহী আদেশ প্রদানের এই ধরনের মধ্যেই সেই সংকটের বীজ নিহিত ছিল, যা পরবর্তীতে মহীরুহ আকারে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করবে। এই ক্ষমতা যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকেই উৎসরিত ['রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী-বিভাগীয় ও আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা চর্চা করিবেন', 'কর ধার্য ও অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে'], তার পরও এর অবারিত চর্চা স্বাধীন বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে যে কটি গুরুতর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটির উদ্গাতা। এমনকি বলা উচিত যে ঘোষণাপত্রের ওই অংশগুলো সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না। বরং প্রথম অধিবেশনেই এই অংশগুলোর বিষয়েও সদস্যদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

এভাবে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাসের শুরুতেই আমরা এক দিকে দেখব ব্রিটিশ কায়দায় সংসদীয় সরকার গড়ে তোলার প্রকাশ্য ঘোষণা, আরেক দিকে ছিল চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রকাশ্য তৎপরতা। গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান, এবং সেই মত প্রকাশ মনমতো না হলে তা দলন। ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হওয়া ভারত-পাকিস্তানের তুলনায় যে বিপ্লবাত্মক চরিত্র রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের থাকার কথা ছিল, তা তো হয়ইনি, আওয়ামী লীগের নিজেরই আয়ত্তে থাকা গণপরিষদের কাছ থেকেও তার স্বাভাবিক কর্তৃত্বটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

দলের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অবিশ্বাসের পরিণতিতে তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সংসদীয় উত্থানের আশঙ্কা থেকে হোক, আর জাসদের মতো অন্য নতুন কোনো ভাঙনের ভীতি থেকে হোক কিংবা আরো ডানপন্থী সাংসদদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার কথিত বিপদ থেকে বাঁচার জন্য হোক, সংসদীয় গণতন্ত্রকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার তত্ত্বগত সূচনা ও বাস্তব অনুশীলন শুরু হয় প্রথম দিনটিতেই। উল্লেখ্য যে প্রতিবেশী ভারতেও সংবিধান সভায় কংগ্রেসের একক আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও সংবিধান প্রণয়নের বৈঠকগুলোতে খোলামেলা বিতর্ককে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশটিকে আওয়ামী মতাবলম্বী আইনবিদগণ পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ন্যায়সংগত কাজ হিসেবেই দেখাতে চান। পাকিস্তানে ১৯৪৭-৫৬ এই ৯ বছর লেগেছিল সংবিধান প্রণয়নে, কেননা সেখানে সদস্যদের পক্ষত্যাগের কোনো আইনি প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞদের আরেকটি অংশ এই অজুহাতটিকে খারিজ করে দেয়, কারণ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না। পাকিস্তান বা ভারতের কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মতো বাংলাদেশের সংবিধান সভাটি যেহেতু একই সাথে সংসদ হিসেবেও ক্রিয়াশীল ছিল না, ফলে এখানে সংবিধান পরিষদে ভোট কেনাবেচার ও সরকার পরিবর্তনের কোনোই সুযোগ ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল একটাই, সেটি হলো পার্টির ইচ্ছা (কিংবা পার্টিপ্রধানের ইচ্ছা) যেন সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়, তা নিশ্চিত করা। এবং এই আদেশবলেই আওয়ামী লীগের বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা গণপরিষদ সদস্য, যাঁরা স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় সংবিধান প্রণয়নের সাথে একমত হতে পারেননি, দল থেকে এবং গণপরিষদ থেকে এই অভিযোগে রীতিমতো বহিষ্কৃত হন। এভাবে শেখ মুজিবের উপর্যুক্ত বক্তব্যে শেখ মুজিব আর নেতৃবৃন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনাই প্রতিফলিত হয় যে গণপরিষদের দলীয় সদস্যগণ নেতৃবৃন্দের হাতের মুঠোয় থাকা নামমাত্র প্রতিনিধি মাত্র। এর পর থেকে কোনো কার্যকর বিষয়েই গণপরিষদ আর আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। মুজিব আমলের প্রথম রাজনৈতিক আদেশটি এভাবে সত্যিকারের সংসদীয় প্রকৃতির শাসনের বদলে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

এর পর থেকে গণপরিষদের বৈঠকে আওয়ামী লীগের দলীয় গোপন

সভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার প্রকাশ্য আলংকারিক অনুমোদন ছাড়া করার মতো কার্যত আর কিছুই বাকি ছিল না।

সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১০ এপ্রিল ১৯৭২। দুই দিনের এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ও এর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে ১০ জুনের মধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৭ এপ্রিল তার প্রথম বৈঠকে বসে। এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত আহ্বান করে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়, এটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিতও হয়। কিন্তু সংগত কারণেই মানুষ এই বিজ্ঞপ্তিতে খুব বেশি সাড়া দেয়নি। প্রথমত, তিনজন বাদে গণপরিষদের সকল সদস্যই আওয়ামী লীগের ছিলেন, তার ওপর আবার আওয়ামী লীগের সদস্যদের স্বাধীন মতামতের ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করায় সাধারণ মানুষ ধরেই নিয়েছিলেন যে এই আহ্বান লোকদেখানো। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকেও সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে তেমন কোনো গণবিতর্ক, মতামত আহ্বান বা অন্য কোনো রকম জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হয়নি। জনগণকে উদ্দীপ্ত ও অংশগ্রহণ করানোর নামমাত্র কর্মসূচির পরও ৯৮টি স্মারকলিপি আসে। ঠিক কী ঘটেছিল এই ৯৮টি স্মারকলিপির ভাগ্যে?

ব্যারিস্টার আবদুল হালিম জনগণের কাছ থেকে আসা এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে খসড়া প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎ নিতে গেলে তিনি জানান যে জনগণের পক্ষ থেকে আসা এই মতামতগুলো কত দূর বিবেচনা করা হয়েছিল সেটা ২৫ বছর পর স্মরণ করাটা কঠিন; ব্যক্তিগত উদ্যোগে হালিম সাহেব সংসদ ভবনের মহাফেজখানার তালিকায় এদের উল্লেখ পেলেও সেগুলোকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা আরো বহু দলিলাদির সাথে এগুলোও যথাযথভাবে গ্রন্থনা করা হয়নি। ফলে যে ন্যূনতম সাড়া জনগণের কাছ থেকে এসেছিল, সেগুলোতে নাগরিকেরা কী বলেছিলেন, কোনো দিন সম্ভবত তা আমরা আর জানতে পারব না।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবরে। সেদিন খসড়া সংবিধানটিকে প্রস্তাব আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এই খসড়া সংবিধানটির বিভিন্ন দিক নিয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সভা স্থগিত করার আহ্বান জানান। তাঁকে সমর্থন করেন স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁদের মতে, জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। 'মূল্যবান সময়ের অপচয়' এড়াতে একই সঙ্গে জনগণের মতামত গ্রহণ ও সংসদে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মত দেন আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন। বিলটি নিয়ে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা চলে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এতে ১০টি অধিবেশনে আটটি কর্মদিবসজুড়ে প্রায় ৩২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। ইতিমধ্যেই ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০৪ জনে নেমে এসেছিল, তাঁদের মধ্য থেকে ৪৮ জন আলোচনা করেন। এর মধ্যে ৪৫ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় পাঁচ দিনজুড়ে প্রায় ১৫ ঘণ্টা আলোচনা হয়। সেখানে তাঁরা কিছুটা স্বাধীনভাবে মত দিতে পারলেও গণপরিষদের অধিবেশনে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। সংসদীয় দলের বৈঠকে দলীয় সদস্যদের ৭৭৫টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, এর মধ্যে ৮০টির মতো প্রস্তাব আওয়ামী সংসদীয় দল গ্রহণ করে এবং প্রস্তাবগুলো গণপরিষদে পাঠানো হয়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল ভাষারীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব। গণপরিষদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দাবি করার কারণে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা কে এম ওবায়দুর রহমানের গঞ্জনার শিকার হওয়ায় এবং গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল আইনের কঠোর প্রয়োগ গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা উত্থাপনকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়।

অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে সংবিধান বিলটির তৃতীয় পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এটা নভেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত চলে। এই চার দিনে আরো ২১ ঘণ্টা আলোচনা হয় সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিয়ে। মোট ১৬৩টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ৭০টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ন্যাপ দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। ২৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজকেও কেউ যদি বাংলাদেশের সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, জাতিদ্বেষী ও স্বৈরতন্ত্রী অনুচ্ছেদগুলোর তালিকা প্রণয়ন করতে চান, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর মানবেন্দ্র লারমা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর দিকে নজর বোলানো তাঁর জন্য অনেকটাই যথেষ্ট হবে।

> ওই শেষ। এই হুঁশিয়ারির পর আওয়ামী লীগের আর কোনো সদস্য গণপরিষদের হাতে সার্বভৌম সংসদের ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কখনও আর তোলেননি।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হরণ

উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ৮৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এর মধ্যে একটি বাদে বাকি সবগুলোই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের উত্থাপিত। এদের অধিকাংশই ভাষাগত পরিমার্জনসংক্রান্ত হলেও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবও ছিল। তিনটির একটি হলো সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদসংক্রান্ত। খসড়া সংবিধানে কেবলমাত্র সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করার বিধান ছিল। সংশোধনীর পর সদস্য নন এমন কাউকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, যদিও তাঁকে ছয় মাসের মধ্যে সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়, অন্যথায় তাঁর মন্ত্রিত্ব বহাল থাকবে না।

দ্বিতীয় সংশোধনীটি খুবই বিতর্কিত, এবং তাৎপর্যপূর্ণও। খসড়া প্রস্তাবেই ৭০ অনুচ্ছেদ যথেষ্ট অগণতান্ত্রিক ছিল, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দল বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর সংসদ সদস্যপদও চলে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল এরকম:

রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা বহিষ্কারজনিত কারণে আসন শূন্য হওয়া

৭০(১) কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন, তাহা হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলি অনুযায়ী তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন রাজনৈতিক দলের সম্পাদকের নিকট হইতে স্পিকার উক্ত দল হইতে কোন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ বা বহিষ্কারের (শেষোক্ত ক্ষেত্রে বহিষ্কারের কারণসহ) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া স্পিকার তাহা সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিবেন

এবং অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইলে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা সাপেক্ষে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে স্পিকার উক্ত সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি প্রদান করিবেন এবং যদি উক্ত সদস্য অনুরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে স্পিকারকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করেন যে, তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন উক্ত বিষয় নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছুক এবং যদি তিনি অনুরূপ নোটিশ প্রদানের সাত দিনের মধ্যে উক্ত আবেদনপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন বা বৈধভাবে দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন বলিয়া নির্বাচন কমিশন স্থির না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য পদে বহাল থাকিবেন এবং স্পিকার তদনুযায়ী সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ স্থগিত রাখিবেন।'

কিন্তু গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিষয়ক আলোচনায় এই প্রস্তাবিত ৭০ ধারায় 'বহিষ্কারের ক্ষেত্রে কারণসহ' এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিষয়টি স্থির করা পর্যন্ত কালক্ষেপণের সুযোগ ছিল, সেই চক্ষুলজ্জাটুকু বাতিল করা হয়, তারই সাথে যুক্ত করা হয় দলের বিপক্ষে ভোট দিলেও তাঁর সদস্যপদ বাতিল করার বিধানটি। সংশোধনী প্রস্তাবের পর চূড়ান্ত চেহারায় ৭০ অনুচ্ছেদ দাঁড়ায় এমন–

৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি–

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন; অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

অর্থাৎ খসড়া প্রস্তাবে 'কারণ দর্শানো' 'বৈধভাবে দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন বলিয়া নির্বাচন কমিশন স্থির না করেন' ইত্যাদি যে সামান্য দ্বিধা ছিল, চূড়ান্ত সংবিধানে তা ঝেড়ে ফেলে সাথে এও যুক্ত করা হয় যে এমনকি দলের বিপক্ষে ভোট দিলেও সদস্যপদ চলে যাবে। বলা যায়, গণপরিষদ সদস্যদের মুখে কুলুপ আঁটার জন্য যে সদস্যপদ বাতিল আদেশটি ছিল, তার হুবহু প্রতিলিপি আমরা ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যদের জন্যও পেলাম। এভাবে সংবিধান প্রণয়নকালীন রাষ্ট্রপতির অগণতান্ত্রিক যে আদেশটি গণপরিষদ সদস্যদের দলের দাসে পরিণত করেছিল, সেটাই এবার সংবিধানসম্মত হয়ে ভবিষ্যৎ সংসদ সদস্যদেরও মুখবন্ধ করার ও দলীয় স্বৈরতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসার কাজটিও সম্পন্ন করল। গণপরিষদের সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশে যেভাবে গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের এখতিয়ারকে বিনষ্ট করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতা সংসদেও অব্যাহত রাখার বন্দোবস্ত এভাবেই সম্পন্ন হলো, ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সংসদের একটা প্রহসন জাতি উপহার পেল।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাসের শুরুতেই আমরা এক দিকে দেখব ব্রিটিশ কায়দায় সংসদীয় সরকার গড়ে তোলার প্রকাশ্য ঘোষণা, আরেক দিকে ছিল চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রকাশ্য তৎপরতা।

জনঅধিকার হরণ ও অন্যান্য জাতির অস্বীকৃতি

তৃতীয় সংশোধনীটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাঙালি ব্যতীত আর সকল জাতির মর্যাদা নির্ধারণসূচক। খসড়া সংবিধানে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা ছিল– 'নাগরিকত্ব ৫। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।'

কিন্তু গণপরিষদে আ. রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী এটি সংশোধন করা হয়। নাগরিকত্ব সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি গণপরিষদের আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া, আপনার প্রস্তাব পেশ করুন।
জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া : *মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে–*
'সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :

'৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'
জনাব স্পিকার : পরিষদের সম্মুখে জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া প্রস্তাব এনেছেন যে–

'সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :

'৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

ড. কামাল হোসেন (আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলি এবং সংবিধান প্রণয়ন মন্ত্রী) : *মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই সংশোধনী গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি এবং এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।*
জনাব স্পিকার : *শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।*
শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা *(পিই-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পিকার সাহেব, জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাঙালি' বলে পরিচিত হবেন।*
মাননীয় স্পিকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সংবিধান বিলে আছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে'; এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে 'বাঙালি' বলে পরিচিত করার জন্য জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালোভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ–কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদের কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়...
জনাব স্পিকার : *আপনি কি বাঙালি হতে চান না?*
শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : *মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোনো দিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশি বলে মনে করি; কিন্তু বাঙালি বলে নয়।*
জনাব স্পিকার : আপনি বসুন। Please resume your seat.
শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : *মাননীয় স্পিকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন, তাতে মনে এ প্রশ্ন জাগে যে বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া ভারতের কেউ বাস করেছে। আমি শুধু বলতে চাই যে বাঙালি বলতে এইটুকু বোঝায় যে, যারা বাংলা ভাষা বলে তাদেরকে আমরা বাঙালি বলি।*
জনাব স্পিকার : *Please resume your seat. আপনি বসুন, আপনি বসুন। এখন পরিষদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে...*
(কণ্ঠধ্বনিতে সংশোধনীটি পাস হয়ে যায়)
শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা *(পিই-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পিকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হলো। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।*
[অতঃপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।]"

(বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, খ-২ সংখ্যা ১৩, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২) ।

এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকই যে বাঙালি, সেই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উন্নয়নের অঙ্গীকারও তিনি সেই বক্তৃতায় করেন বটে, কিন্তু পরের বছরের সংসদেই দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন নতুন সেনানিবাস ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কার্যালয় বানানোর উদ্যোগ নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উদ্বেগ প্রকাশ। এমনিভাবেই সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র লারমা জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ আরো কিছু বিষয়ে সংবিধানকে কিছুটা গণতান্ত্রিক করার সংশোধনী প্রস্তাব তোলেন; সেগুলো সবই প্রত্যাখ্যাত হয়। অন্য কোনো সদস্যই এমন কোনো প্রস্তাব হাজির করেননি। এঁরা দুজন খসড়া সংবিধানের ৩২, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৭, ৬৬, ৭০, ১৩৫ ধারার অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে তার সংশোধনী প্রস্তাব হাজির করেন। সবগুলো প্রস্তাবই কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিকও ছিল, কারণ এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সমর্থন করলে সেই নির্দিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেত।

দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে ৩২ অনুচ্ছেদের ওপর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংশোধনী প্রস্তাবের কিছু অংশ তুলে ধরছি–

খসড়া সংবিধানে ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী–

জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।

'৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

শ্রী লারমা : *জনাব স্পিকার সাহেব, এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হলো, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত' শব্দাবলি যদি এই অনুচ্ছেদে রাখা হয় এবং সেটা যদি এই পরিষদে গৃহীত হয়ে যায়, তাহলে আগামীতে যাঁরা আইন পরিষদে আসবেন, তাঁরা যদি 'আইনানুযায়ী ব্যতীত' শব্দাবলির মাধ্যমে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, তাহলে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার জন্য এই যে ৩২ অনুচ্ছেদটি করা হয়েছে, সেই অনুচ্ছেদের কোনো অর্থ থাকবে না। তার কারণ, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার জন্য 'আইনানুযায়ী ব্যতীত'–এই শব্দাবলির মাধ্যমে ক্ষমতার দ্বারা এমন এমন আইন গৃহীত হতে পারে, যার দ্বারা জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে।*

এখন আমাদের এখানে পাবলিক সেফটি আইন নাই, কিন্তু এই অনুচ্ছেদ দ্বারা তা প্রণয়ন করা যাবে যে কোনো সময়ে এবং এই অনুচ্ছেদ যদি এইভাবে গৃহীত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে যদি এই 'আইনানুযায়ী ব্যতীত' শব্দাবলির দ্বারা জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার আইন বলবৎ হয়, তাহলে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কোনো সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ মানুষের নাগরিক জীবনের যে স্বাধীনতা, স্বীয় বিবেকবুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যে অভিব্যক্তি, তা সম্পূর্ণরূপে খর্ব হয়ে যাবে।

তাই আমি এই অনুচ্ছেদে 'আইনানুযায়ী ব্যতীত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'আদালতের অনুমোদন' শব্দাবলি সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব করছি।

আদালতের কাছে যদি আমাদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার এই রক্ষাকবচ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের যে স্বাধীনতা, তা নিশ্চয়ই সংরক্ষিত হবে।

(প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়)

মানবেন্দ্র লারমার এই আশঙ্কা সত্যমূলক ছিল, অচিরেই ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনীতে 'জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ' অংশেরই ৩৩ অনুচ্ছেদে আদালতের অনুমোদন ছাড়াই নিবর্তনমূলক অন্তরিন রাখার ব্যবস্থা সংবলিত দফা যুক্ত করা হলো, তারই সাথে জরুরি অবস্থা জারির বিধান ও জরুরি অবস্থার সময়ে সকল মৌলিক অধিকার স্থগিতের বিধান সংবলিত অংশও গৃহীত হলো।

সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে তেমন কোনো গণবিতর্ক, মতামত আহ্বান বা অন্য কোনো রকম জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হয়নি। জনগণকে উদ্দীপ্ত ও অংশগ্রহণ করানোর নামমাত্র কর্মসূচির পরও ৯৮টি স্মারকলিপি আসে। ঠিক কী ঘটেছিল এই ৯৮টি স্মারকলিপির ভাগ্যে?

একইভাবে এ দুই সদস্য বাকস্বাধীনতা নিয়েও আলোচনা করেন, যদিও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি মোটেই, এমনকি তাঁরা সংবিধানের এই ধারাগুলোর সাথে পাকিস্তানেরই মিলগুলোও দেখিয়ে দেন, যেমন–মানবেন্দ্র নারায়ণ ৩৯ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেন–

সংবিধান বিলের ৩৯ অনুচ্ছেদের ১ম দফায় রয়েছে–

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

তারপর ২য় দফায় রয়েছে :

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে–

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের; এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হল।

এখানে আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো, বাকস্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা শর্তহীন হতে হবে। সংবাদপত্র-জগতের স্বাধীনতা বা চিন্তা-জগতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু এই অধিকার আবার এক দিক দিয়ে খর্ব করা হয়েছে। যেমন–রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে আমার বাকস্বাধীনতা থাকবে না। বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ কোন রকম উক্তি করার ব্যাপারে আমার বাক-স্বাধীনতা থাকবে না। জনশৃঙ্খলার নামে আমার বাকস্বাধীনতা থাকবে না। শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে যদি কোন প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে আমার বাকস্বাধীনতা থাকবে না।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, এখানে বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অতীতের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, তাহলে জানা যাবে যে, স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারও এ রকমভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে, জনশৃঙ্খলার নামে, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নামে, মানহানির নামে, আদালত অবমাননার নামে এদেশের জনসাধারণের এবং জনপ্রতিনিধিদের অধিকার খর্ব করেছিল।

এই পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তথাকথিত পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার, স্বৈরাচার আইয়ুব সরকারের নির্যাতন সম্বন্ধে। এখানে যেসব মাননীয় সদস্য রয়েছেন, তাঁদের অনেকেই সেই নির্যাতন ভোগ করেছেন। এখানেও যদি সেই প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব হবে, যেমন হয়েছিল আইয়ুব সরকারের আমলে..." (ইত্যাদি)

এর জবাবে জনাব নুরুল হক যা বলেছিলেন, তার একাংশ উদ্ধৃত করাটা আওয়ামী লীগের মনোভাব বোঝানোর জন্য যথার্থ হবে :

জনাব মো. নুরুল হক : *৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্ন রয়েছে। সেখানে কোন প্রকার বিধিনিষেধ দেওয়া হয় নাই। বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার যে, সে স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি, কিন্তু তার মানে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। বাকস্বাধীনতা মানে লাইসেন্স নয়, আদালতের অপমান করার অধিকার নয়। নৈতিকতার বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের নামে, স্বাধীনতার নামে যা খুশি তা-ই করা হবে, এইটা কোনদিন রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে না, আইনে সমর্থন করতে পারে না। আজকে দেখছি, তিনি এই রকম একটা সংশোধনী এনেছেন। সেই মোতাবেক যদি এইটাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকবে না; থাকবে বনতন্ত্র।*

সেজন্য এই সংশোধনী আদৌ গ্রহণ করা যায় না। আমি তাই অনুরোধ করব, শ্রী

লারমা এবং শ্রী সেনগুপ্ত যেন এই ধরনের প্রস্তাব না আনেন।"
(ভোটে লারমার সংশোধনী প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়)

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক নুরুল হকের আলোচনাটির সারবত্তা বোঝা যাবে রাজনৈতিক পত্রিকাগুলোর ওপর সরকারের দমন-পীড়নের দিকে নজর রাখলে, পয়লা নভেম্বরের এই অধিবেশনের আগেই ২২ সেপ্টেম্বর নিষিদ্ধ হয়েছে মওলানা ভাসানীর 'হক কথা'সহ আরো অনেকগুলো পত্রিকা।

খসড়া সংবিধান বিষয়ে চূড়ান্ত পাঠ অনুষ্ঠিত হয় ৪ নভেম্বর। সেদিনের পাঠে দুই ঘন্টা সময় নেওয়া হয়। এরপর সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান প্রণয়ন সভায় খসড়া উত্থাপনের মাত্র ২৪ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান চূড়ান্তরূপে গ্রহণের উদাহরণ বিরল। প্রতিবেশী ভারতে খসড়া সংবিধান প্রকাশ করা হয়েছিল জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে এবং গ্রহণ করা হয়েছিল ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯, সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল ১১৪ কর্মদিবস। আগেই বিস্তারিত আলাপ করা হয়েছে কোন প্রক্রিয়ায় এবং কিভাবে সংবিধান প্রণয়নের কার্যক্রমে বাংলাদেশে গণপরিষদের সদস্যদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত ও রুদ্ধ করা হয়েছিল। বিপরীতে ভারতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য থাকলেও দলীয় সদস্যদের স্বাধীন আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। সংবিধান প্রণয়নী বিতর্ক কতটা অগুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার বেশ কিছু নিদর্শন সমকালীন অনেক রচনায় পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক আলোচনার বাইরে হাস্যরসই সেখানে অধিক সময় পেয়েছিল। ভারত বা পাকিস্তানের সাথে তুলনায় বিষয়টা আরো মর্মান্তিক এই কারণে যে ওই দুটি রাষ্ট্রের থেকে ব্যতিক্রমীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল রক্তক্ষয়ী একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জনগণের মধ্যে যে উচ্চতর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিল, তার কোনো বিপ্লবাত্মক প্রতিফলন সংবিধান প্রণয়নে পাওয়া যায় না।

মোট ১৬৩টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ৭০টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ন্যাপ দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। ২৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজকেও কেউ যদি বাংলাদেশের সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, জাতিবিদ্বেষী ও স্বৈরতন্ত্রী অনুচ্ছেদগুলোর তালিকা প্রণয়ন করতে চান, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর মানবেন্দ্র লারমা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর দিকে নজর বোলানো তাঁর জন্য অনেকটাই যথেষ্ট হবে।

খসড়া সংবিধান প্রস্তাবের ওপর সাধারণ আলোচনার পর ১৬৩টি সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়, এর মধ্যে ৮৪টি গৃহীত হয়, যার মধ্যে ৮৩টি আওয়ামী সদস্যদের এবং একটি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর। কিন্তু অধিকাংশ সংশোধনীই শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল না, এগুলো ছিল ভাষাগত সংশোধনী।

সংবিধান প্রণয়নকারী সভাকে নির্বাহী বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি বলে পুরো সময়টি রাষ্ট্রপতি নির্বাহী আদেশবলে আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশবলে ১৬৬টি আইন প্রণয়ন করেন, এর মধ্যে পিও ফাইভ অব নাইনটিন সেভেনটি টু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই আদেশে বাংলাদেশের হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত আদালত হিসেবে অনুমোদন পায়। কিন্তু এই আদেশের মধ্যে আইনের শাসনের চেতনা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত ছিল, উচ্চ আদালতকে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি; রিট জারি করা, হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রোহিবিশন, কো-ওয়ারানটো, সারটিওরারি আকারে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান বন্ধ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ নতুন সংবিধান কার্যকর হয় বটে, তবে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল নতুন সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ২১০টি নির্বাহী আইন প্রণয়ন করা হয় কোনো রকম আলোচনা বা জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার সাথে পরামর্শ ও বৈঠক ছাড়া।

এভাবে নতুন সংসদের অধিবেশন বসার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র কার্যত রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশবলে পরিচালিত হয়, যদিও আওয়ামী লীগ দাবি করে যে তারা একদম শুরু থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান ছিল।

গণপরিষদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে এইভাবে সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদটিকে–

ক. কেবলমাত্র সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা;

খ. তাদের আইন প্রণয়ন করার অধিকার না দেওয়া;

গ. নির্বাহী পরিষদের ওপর তাদের কোনো তদারকির অধিকার না দেওয়া;

ঘ. সংবিধান পরিষদের সদস্যদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে প্রস্তাব উত্থাপন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রদান না করা (এবং কার্যত এর মাধ্যমে সংবিধান পরিষদকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটিতে পর্যবসিত করা)।

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসকে শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং একটিমাত্র দলের স্বার্থরক্ষায় পরিচালিত করেছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থকে আওয়ামী লীগের স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গি করা হয়, এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে আবার একক নেতার মুখ্য ভূমিকার কারণে আর কোনো ভিন্নমত প্রকাশের পরিসর খুব বেশি ছিল না।

বিরোধী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া

১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান উত্থাপন হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই প্রতিক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–মস্কোপন্থী বাম রাজনৈতিক ধারা, চীনপন্থী বা সেভাবে পরিচিত রাজনৈতিক ধারাসমূহ এবং অন্যান্য।

মস্কোপন্থীদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সাধারণভাবে এই সংবিধানকে স্বাগত জানায়। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়:

> *বিশেষত খসড়া সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা বিলোপের জন্য যেইসব নীতি ঘোষিত হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক দল ও সংস্থা গঠন নিষিদ্ধ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, সেইসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার যেইসব বিধান খসড়ায় রহিয়াছে, সেইগুলিকেও পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। ঐসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলি খসড়া সংবিধানে পরিবেশিত হওয়াতে পার্টি সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছে। পার্টি খসড়া সংবিধানকে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করে।*

এরপর সংবিধানে কিছু ধারার অগণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, 'ঐসব ধারা-উপধারা যথাযোগ্য সংশোধনের অপেক্ষা রাখে, তবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরে উহা সরকার কর্তৃক কিভাবে কার্যকর হয়, তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর

করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, বর্তমান খসড়া দেশের সংবিধানরূপে গৃহীত হইয়া উহা সঠিকভাবে কার্যকর করা হইলে কতকগুলি ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার মাধ্যমে ও সহায়তায় দেশ ও সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।' সিপিবি আরো মত প্রকাশ করে, 'এই বিষয়ে অন্তত স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলসমূহ এবং গণপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ গ্রহণ একান্ত জরুরি ছিল। সংবিধানের পক্ষে সমগ্র জনতার পরিপূর্ণ সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে উহা সহায়ক হইত। মনে হয়, শাসক দলের সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই।'

তবে মূলগতভাবে তাঁরা সংবিধানকে ইতিবাচক বলে গ্রহণ করেন এবং সংবিধানকে আরো গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে পার্টি নেতা আবদুস সালাম ও মণি সিংহ ১১টি প্রস্তাব পেশ করেন। সংবিধানের 'কালাকানুনগুলো যেন শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়, সেটার দিকে সজাগ প্রহরা রাখার কথা'ও তাঁরা উল্লেখ করেন। যদিও এই 'সজাগ প্রহরা রাখা'র কাজ তেমন দেখা যায় নি; সরকার অচিরেই ধর্মঘটকে বেআইনি করে, শ্রমিক অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদকদের গ্রেপ্তার, পত্রিকা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পত্রপত্রিকাকে দমন করার চেষ্টা করে।

ন্যাপ (মোজাফফর) সংবিধানের বেশ কিছু ধারার অগণতান্ত্রিক চরিত্রের সমালোচনা করে বলে, 'শাসনতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র কতকগুলি সদিচ্ছার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূরণে রাষ্ট্র আইনানুগভাবে বাধ্য নহে।' এরপর ন্যাপ 'প্রতিটি নাগরিকের কর্ম ও জীবিকার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনধারণের উপকরণসমূহের গ্যারান্টি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রদান' করার দাবি জানায়। এছাড়া শাসনতন্ত্রে পুঁজিবাদী সম্পত্তির বিকাশ ঘটতে দেওয়া যাবে না–এই মর্মে সুস্পষ্ট ঘোষণারও তারা দাবি জানায়। অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য বিশেষ বিধান রাখার দাবিও জানানো হয়।

জনাব স্পিকার : আপনি কি বাঙালি হতে চান না?
শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোনো দিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই।

আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক মিত্রতার সম্পর্ক থাকায় মস্কোপন্থী সিপিবি ও ন্যাপ কখনও কখনও মৃদু সমালোচনা করলেও এসবের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি নিতে পারেনি। বরং এ ধরনের কর্মসূচির নেওয়ার কারণে জাসদ ও ন্যাপ (ভাসানী) বরং সিপিবির রোষের শিকার হয়, এই সময়ে প্রকাশিত বহু বিবৃতি ও ভাষ্যে সিপিবি সরকারের দুর্নীতি ও লুণ্ঠন এবং ব্যর্থতা স্বীকার করেও 'সরকারকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করার জন্য' ওই বিরোধী দলগুলোর গৃহীত আন্দোলন কর্মসূচির নিন্দা করে।

চূড়ান্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র লারমা সংসদে তাঁদের আলোচনায় খসড়া শাসনতন্ত্র নিয়ে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতাও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানের ওপর জনরায় নেওয়ার জন্য গণভোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন–

> যেসব ধারার নিন্দা আওয়ামী লীগ '৫৬ সালে করেছিল, হুবহু সেগুলোই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবিষ্ট করিয়েছে। '৬২ সালের শাসনতন্ত্র করা হয়েছিল আইয়ুব খানকে সামনে রেখে। বর্তমান শাসনতন্ত্রে বিলে প্রধানমন্ত্রীকেও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।...শাসনতন্ত্রে যখন সমাজতন্ত্র করার কথা বলা হয়েছে, তখন শাসনতন্ত্রের ওপর বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে আইনমন্ত্রী গিয়েছেন ব্রিটিশের কাছে।'[৫]

মানবেন্দ্র লারমা বলেন, 'শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটা ধারাই প্রমাণ দেয় যে, এক হাতে জনগণকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, আবার অন্য হাতে সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।' জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবি করে তিনি বলেন–

> *আমি সেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসত্তার একজন... আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু আমাদের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের। খসড়া সংবিধানে আমাদের জাতিসত্তার কথা নেই। একথা আমি শুধু আজ বলছি না, ইয়াহিয়া আর আইয়ুব আমলেও বলেছি... '৫৬ ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। তাই জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি করার সময় আমাদের তা মনে রাখতে হবে। সংবিধান এমন হতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা তাকে গ্রহণ করে।*

অন্য বামপন্থীরা সংবিধান সভা বা গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, খসড়া সংবিধানের অমোচনীয় ও মৌলিক অগণতান্ত্রিক চরিত্র বিষয়েও তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করেন। লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অমল সেন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এই সংবিধান সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে ধরনের সাংবিধানিক অধিকার থাকে, তা-ও নেই।'

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়,

> *বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বলা চলে। ...এই শাসনতন্ত্র চালু হলে দেশে শ্রেণিশাসন অব্যাহত থাকবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কুখ্যাত পাকিস্তানি নাগরিকদের যে সম্পত্তির মালিক সরকার হয়েছে, খসড়া সংবিধানে সেই সম্পত্তিকে একটা সমাজতান্ত্রিক লেবেল লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ...এমনকি কতিপয় আইন কার্যকর থাকবে বলে ঘোষণা করে বিদেশি মূলধন জাতীয়করণ না করার সরকারি সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পাকাপোক্ত করা হয়েছে।*

জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ তাঁদের বিবৃতিতে খসড়া সংবিধানের অসংখ্য সমালোচনা করে বলেন, 'এক কথায় বলা যায়, এটা একটা অকেজো সংবিধান। তবে বর্তমান পরিবেশে এই বাজে সংবিধানও সংবিধানহীন দেশের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো।'

মওলানা ভাসানী খসড়া সংবিধানকে শুধু আক্রমণই করেননি, তিনি ঐ সংবিধান সভার বৈধতাকেই পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ করেন এই বলে যে, এই গণপরিষদ ইয়াহিয়া খানের আদেশবলে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এছাড়া আরো বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ধারার উপস্থিতি, বিদেশি মালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা, গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদ উচ্ছেদে কার্যকর ভূমিকা না রাখা ইত্যাদি প্রশ্নে প্রস্তাবিত সংবিধানের সমালোচনা করেন। তাঁদের অধিকাংশই গঠনগত দিক দিয়ে এই সংবিধানের ত্রুটিগুলোকে অমোচনীয় বলে মনে করতেন।

যাঁরা এই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের শ্রেণিগত দুর্বলতা আর চারিত্রিক অস্থিরতার ছাপটি সংবিধানে চিহ্নিত করেছেন বদরুদ্দীন উমর তাঁর ওই সময়কার একটি পর্যবেক্ষণে। যে

অনুচ্ছেদটির উপস্থিতির কারণে গণপরিষদের কোনো সদস্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে আইনানুগভাবে অক্ষম ছিলেন, এবং যে অনুচ্ছেদটি গণপরিষদকে কার্যত আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সাথে একাকার করে ফেলেছিল, সেই বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশটিও খসড়া সংবিধানের সংশোধনীতে একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে (অনুচ্ছেদ ৭০) সংযোজিত হয়। এই ৭০ অনুচ্ছেদটিকে উপলক্ষ করে বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির সংকটটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, খসড়া সংবিধান প্রকাশ পাওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর 'A constitution for perpetual emergency' নামের একটি নিবন্ধে তা প্রকাশিত হয়, বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায় 'চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার তরে সংবিধান'। এখান থেকে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক–

শাসকশ্রেণি যে রাষ্ট্রের মৌলিক সবগুলো প্রতিষ্ঠানকেই বিপুল পরিমাণে অবিশ্বাস করে, এই সংবিধান তারই ইঙ্গিতবহ এবং সংবিধানটি সংসদীয় সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোগান দেয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ইঙ্গিত দেয় যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনকি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও নির্ভরযোগ্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে এটাকে স্রেফ প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একটা হাতিয়ার বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যাকে শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে অসীম ক্ষমতা চর্চা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই খসড়া সংবিধান পরিষ্কারভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কেবল অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিতই নয়, মোটা দাগে তারা অসংহতও।...এই রকম একটি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী দৃশ্যমান রয়েছেন সম্পূর্ণ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় শর্ত হিসেবে। এবং এ কারণেই অন্যদের নানা রকম আপত্তি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁরা তাঁদের আস্থা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ না করে তাঁর ওপর স্থাপন করতেই বাধ্য। এবং এ কারণেই শাসকশ্রেণির একনায়কত্ব একজন প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের রূপে পর্যবসিত হওয়ার দিকে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বৈরতন্ত্র। সুনির্দিষ্টভাবে শেখ একজন বেসামরিক ব্যক্তি বলেই প্রাথমিক পর্বে এই স্বৈরতন্ত্র একটা সংসদীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগামীকাল যদি পরিস্থিতি বেসামরিক কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায় এবং শাসকশ্রেণির জন্য আরো খারাপ হয়ে ওঠে, সংসদীয় ধরনটি রাষ্ট্রপতি ধরনের শাসন দিয়ে কিংবা আরো খারাপ কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এইসব জরুরি কারণবশতই এখানে একটি 'চিরস্থায়ী' জরুরি অবস্থার পূর্বানুমান করা হয়েছে এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠীর জন্য একটি সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে সকল ধরনের জরুরি ক্ষমতা অনুশীলনের বন্দোবস্ত করারই একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।'

> সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র লারমা জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ আরো কিছু বিষয়ে সংবিধানকে কিছুটা গণতান্ত্রিক করার সংশোধনী প্রস্তাব তোলেন; সেগুলো সবই প্রত্যাখ্যাত হয়। অন্য কোনো সদস্যই এমন কোনো প্রস্তাব হাজির করেননি।

ওপরের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসকশ্রেণির চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের সাথে সংবিধানের মাঝে ফুটে ওঠা নিরাপত্তাহীনতাবোধের যে সম্পর্ক বদরুদ্দীন উমর স্থাপন করেছেন, সেটা তুলনাহীন। এই পর্যবেক্ষণ যে ভুল ছিল না, তা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নিজেই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে নামমাত্র এই 'সংসদীয়' পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করেছিল। এমনকি রাষ্ট্রপতির শাসন ধাঁচের রাষ্ট্রগুলোতেও তার একচেটিয়া ক্ষমতার ভারসাম্য হিসেবে যে ব্যবস্থাদি থাকে, তার সম্ভাবনাগুলোও ধ্বংস করা হলো। আদি সংবিধানে জরুরি অবস্থার কোনো বিধান না থাকলেও যে জরুরি অবস্থা এবং শাসকশ্রেণির অসংহত দশা বদরুদ্দীন উমর আশঙ্কা করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের বদলে একদলীয় শাসন, এবং কার্যত দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত শাসন শুরু হলো। অধিকাংশ পত্রিকা নিষিদ্ধ হলো, এবং যে অল্প কিছু গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবিধানের ছিল, তা-ও রদ করা হলো :

১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসনও যে বাহাত্তরে সংবিধানকে উচ্ছেদ করেনি, তার কারণ গুণগতভাবেই '৭২ এর এই সংবিধানটিই এমন ছিল যে এই কাঠামোর ভেতর ছোটখাটো কিছু সংশোধনীর মাধ্যমেই সামরিক শাসকরাও নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পেরেছিল।'

চার মূলনীতি ও রাষ্ট্রের গতিমুখ

বাহাত্তরে সংবিধানের চার মূলনীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ) নিয়ে যে কোনো সাধারণ পর্যালোচনায় তাই এটা প্রতিভাত হবে যে এই সংবিধান প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক ছিল না। এই সংবিধান কোনো গণতান্ত্রিক উপায়ে রচিত হয়নি। আগেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এটা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। পাকিস্তান আমলের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' ভিন্ন নামে বহাল রাখা হয়েছে, বাতিল করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণ হিন্দু সম্পত্তি এই আইনের বলে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালীরা দখল করে। ধর্মনিরপেক্ষতার হাঁকডাক যেটুকু দেওয়া হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতনার যে বিকাশটি ঘটেছিল, তার সাথে একটা ছেলেভোলানো আপোস। মাদ্রাসা শিক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ এই সময়টুকুতে নেওয়া হয়নি। বরং তাকে জিইয়ে রাখা ও শক্তিশালী করার সকল বন্দোবস্তই ধীরে ধীরে করা হতে থাকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত রমনা কালীবাড়ির সম্পত্তি '৭২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তারা বুলডোজার দিয়ে সেটি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। মন্দিরের ভক্তরা সুবিচারের আশায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেও কোনো ফল পাননি, বরং তাঁদেরকে বালুর মাঠে তাঁবুতে স্থানান্তর করা হয়। পরে জিয়াউর রহমানের আমলে সেখান থেকেও তাঁদের সবলে উচ্ছেদ করা হয়।

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক! শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল এটাকে বলেছিল 'পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতন্ত্র'। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া যে সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ হয়, সেটাকেই সমাজতন্ত্র নামে চালানো হয়। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি, পরে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি তাঁর বাকি সব দাবি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, অন্তত বিনা মূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হোক। সেটুকুও করা হয়নি এই 'সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে'। ভূমি সংস্কার বা গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা সম্পর্কের ন্যূনতম কোনো বদল করা হয়নি। কারখানায় পাকিস্তান আমলের চেয়ে শ্রমিকদের বেতনে মোট অংশ দশমিক অঙ্কে অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বরং অব্যাহত পরিকল্পিত দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রায়ত্তকৃত কারখানাগুলো অচিরেই অলাভজনক হয়ে পড়ে, সেগুলো জনগণের অর্থের ভর্তুকিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গুটিকতক মানুষের সম্পদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থত, বাঙালি জাতীয়তাবাদ! এর মর্ম আদিবাসীরা আজও টের পাচ্ছেন। সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক হওয়ার বিষয় বাদ যাক, এই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় অর্থের দুর্নীতি, অপচয় আর তসরুপের বিষয়েও কতখানি শঠতার আশ্রয় নিয়েছিল সেটা বোঝা যাবে ১৯৭২ সালের

রাষ্ট্রপতির আদেশে জারি করা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (The Bangladesh Comptroller and Auditor-General Order, 1972 (P.O. No. 15 of 1972) আইনটির দিকে চোখ বোলালে। পৃথিবীর প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় খরচাপাতির হিসাব নিরীক্ষণ করা হয় বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির মাধ্যমে, এবং সেটি নিয়মিতভাবে সংসদে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। বাংলাদেশে প্রথম থেকে এই কমিটিকে সংসদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে আমলাতন্ত্র ও নির্বাহী বিভাগের হাতে স্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির হাতে এই কমিটির প্রধানের নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত করে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটির দলীয়করণ ও নিরাপদকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একটি কমিটি হিসেবেও এটি প্রথম থেকে আজও অকার্যকর। ১৯৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী–

অষ্টম ভাগ

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭(১) বাংলাদেশের একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক হিসেবে অভিহিত) থাকিবেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন।

(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

(১২৮-১৩১ অনুচ্ছেদ কার্যাবলির বর্ণনা ইত্যাদি)

১২৮(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন মহাহিসাব নিরীক্ষককে সেইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন বিধানাবলি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা অনুরূপ বিধানাবলি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহাহিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।'

সংবিধানকে আরো গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে পার্টি নেতা আবদুস সালাম ও মণি সিংহ ১১টি প্রস্তাব পেশ করেন। সংবিধানের 'কালাকানুনগুলো যেন শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়, সেটার দিকে সজাগ প্রহরা রাখার কথা'ও তাঁরা উল্লেখ করেন।

এখানে অস্পষ্টতার আড়ালে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে জটিল করে ফেলা হয়েছে। প্রথমত, মহাহিসাব নিরীক্ষক পদটিকে প্রত্যক্ষভাবে সংসদের অধীনে না এনে রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ করা হয়েছে, তিনি তাঁর কাছেই প্রতিবেদন পেশ করবেন। রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদন সংসদে অবশ্যই উপস্থাপন করবেন এমন কথাও বলা হয়নি, বলা হয়েছে ব্যবস্থা করবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক-এর কার্যপ্রণালীকেও সংসদ আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অধীনে রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭০ এর কথা মনে রাখলে আমরা বুঝব, সংসদ সদস্যরা নিজ উদ্যোগে এমন আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম কি না, কিংবা রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বাধ্য করতে পারে কি না। এর সাথে যদি আমরা সংবিধানের আরেকটি অনুচ্ছেদ মিলিয়ে দেখি–

সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ ৮৫

সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এই আইন যখন প্রণীত হয়, তার আগেই আসলে বাংলাদেশের সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের একটা নির্দিষ্ট গড়ন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তা আজও অব্যাহত আছে। বস্তুত কোনো প্রতিবেদনই পরের সংসদে মহাহিসাব নিরীক্ষক দাখিল করেননি। এটা করাই হয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থের যে বিপুল তসরুপের ওপর এই শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকে দাঁড়িয়েছিল, তাকে আড়াল করার জন্য। এই সংবিধানের বলেই বিদেশের সাথে সম্পাদিত অধিকাংশ চুক্তি গোপন থেকে যায়, জনগণের সামনে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, জনপ্রতিনিধিদের সামনেও আলোচনার দরকার পড়ে না।

এটা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের যে উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল, সেই বিপ্লবী চেতনার পথে একমাত্র কার্যকর প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা ছিল আওয়ামী লীগের। জনপ্রিয় সকল স্লোগান আত্মসাৎ করেও পুরনো ক্ষমতা সম্পর্ক ও সাম্রাজ্যবাদী যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ অটুট রাখতে পেরেছিল দলটি। এই সংবিধানে তাই সরকারি দলকে একক কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, কারণ ক্ষমতার গণতন্ত্রায়ণ তাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। এরই ধারাবাহিকতা আমরা পরের কয়েক দশক ধরে দেখছি।

আওয়ামী লীগের বাইরের তিনটি ধারা–মস্কোপন্থী ও চীনপন্থী ধারা এবং জাসদ– এই তিন অংশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সংবিধান কায়েমে কার্যকর কোনো ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলত, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর দিক দিয়ে কার্যকর কোনো বাধা ছাড়াই বাংলাদেশে এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো, যার দায় ঐতিহাসিকভাবেই আজও দেশের জনগণ বহন করে আসছে। এদিক দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়, এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বিপরীতভাবে একটি অগণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদনির্ভর, ফ্যাসিস্ট ভাবসম্পন্ন ও জাতিবিদ্বেষী রাষ্ট্ররূপেই বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে, যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী কয়েকদশকে দেখা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান তাই সর্বতো অর্থেই সেই বিয়োগান্ত পরিণতির স্মারক।

ফিরোজ আহমেদ: লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী

ইমেইল: subarnasava@gmail.com

টীকা

১. এই আইন (এবং এর আগে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি প্রণীত বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ) অনুযায়ী গঠিত গণপরিষদই বাংলাদেশের সংবিধান সভা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এই সংবিধান সভার সদস্যরা হলেন ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) ও প্রাদেশিক পরিষদের (প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি) নির্বাচিত বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনকারী জীবিত সদস্যগণ। ওই নির্বাচনদ্বয়ে নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যা ৪৬৯ (১৬৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও ৩০০ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) হলেও গণপরিষদের জন্য মনোনীত সর্বমোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৩০। বাকি ৩৯ জনের মধ্যে ১০ জন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন (পাঁচজন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে শহীদ হন), দুজন পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখানোর দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন এবং চারজন বাংলাদেশ যোগসাজশকারী বা দালাল

(বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশে গ্রেপ্তার হন। এবং বাকি আরো ২৩ জন সদস্য দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ২২ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ, [কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (সিসেশন অব মেম্বারশিপ) অর্ডার (পিও ন. ২৩ অব ১৯৭২)] এর অধীনে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গণপরিষদে অংশগ্রহণেরই অধিকার হারান, যদিও তাঁরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিই ছিলেন।

এই ৪৩০ জন গণপরিষদ সদস্যের মধ্যে অচিরেই আরো ১৯ জন তাঁদের সদস্যপদ হারান আওয়ামী লীগ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে, গণপরিষদ চলাকালে। অন্যদিকে সরকারের দুর্নীতি আর অসদাচরণের প্রতিবাদে গণপরিষদের তিনজন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে তাঁদের সদস্যপদ হারান, তিনজন মৃত্যুবরণ করেন, সংবিধান পরিষদ থেকে একজন পদত্যাগ করে বৈদেশিক দপ্তরে যোগ দেন। অবশিষ্ট ৪০৩ জন সদস্য সংবিধান পরিষদে শেষ পর্যন্ত ছিলেন, এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন বিরোধীদলীয় সদস্য–ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর বাকি দুজন স্বতন্ত্র সদস্য।

২. এই সময়ের 'হক কথা'র সংখ্যাগুলো এ জাতীয় অজস্র তথ্য আর সংবাদে ভরপুর ছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে সরকারি দলের বেপরোয়া দুর্নীতি, লুণ্ঠন, ডাকাতি, অপহরণ আর রাজনৈতিক নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরা সাপ্তাহিক 'হক কথা' অচিরেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে, সংবাদপত্রের আকালের সেই যুগে এই সাপ্তাহিকীটির প্রচারসংখ্যা ৬০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সংকলন ঘাঁটলেই যে কেউ এটা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না যে পত্রিকাটিতে কী বিপুল পরিমাণে গণপরিষদ সদস্যদের (এমসিএম–মেম্বার অব দ্য কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নামেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন) অপরাধমূলক তৎপরতার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. গণচীনের নামে নামকরণ হলেও চীনদেশের সাথে এঁদের কার্যত কোনো সম্পর্ক ছিল না, এটা ছিল বিপ্লবের পন্থা প্রশ্নে রুশ ও চীন পার্টির মহাবিতর্কের জেরে দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে দ্বিধাবিভক্তিজনিত দুটো মতধারা; মস্কোপন্থীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন যতকাল টিকে ছিল, তার সাথে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও নানা সুযোগ-সুবিধার নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বজায় রাখলেও চীন এ রকম কোনো দায়দায়িত্ব পালন করত না। ফলে চীনপন্থী দলগুলো মূলত দেশে দেশে স্বাধীনভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল।

৪. ব্যারিস্টার আমীর অচিরেই আবিষ্কার করেন যে উক্ত বৈঠকে এই মতামত ব্যক্ত করার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান এই সন্দেহ করা শুরু করেন যে ব্যারিস্টার আমীর নিজে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় ক্যুর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত, এবং এরই অংশ হিসেবে এই প্রস্তাব তোলা হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতার পর আমীর সাহেব প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন বলে ব্যারিস্টার হালিম সাহেবকে ঐ একই সাক্ষাৎকারে জানান।

৫. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এখানে ব্রিটিশদের পরামর্শ গ্রহণের নিন্দা করেছেন, এটা নতুন প্রজন্মের বহু পাঠকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকতে পারে। স্মর্তব্য, মওলানা ভাসানীর পত্রিকা 'হক কথা'য়ও খসড়া সংবিধান প্রণয়নের পর কামাল হোসেনের ভারত ও যুক্তরাজ্য সফরের নিন্দা করা হয়। সমসময়ে 'হক কথা'র একটি শিরোনাম ছিল 'সংবিধানের ভারত যাত্রা'। এই সফরের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ভারত ও ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক চর্চা সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ। সুরঞ্জিত ও ভাসানীর আশঙ্কাটা মূলত একই, সেটা হলো বাংলাদেশে নয়া ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃস্থাপনের উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ছিল ওই শক্তিগুলোর (সুরঞ্জিত অবশ্য শুধু যুক্তরাজ্যের কথাই বলছেন) লক্ষ্য। তবে কামাল হোসেনের ভারত ও যুক্তরাজ্য সফর বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দূর করতে কিংবা ইতিবাচক কোনো উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তাঁদের ব্রিটিশ ও ভারতীয় পরামর্শকগণ যদি এই সংবিধানকে 'গণতান্ত্রিক' বলে অনুমোদন করে থাকেন, তাহলে সেটা থেকেই এই পরামর্শকদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা পরিষ্কার বোঝা যায়, এবং সেটা যে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আকাঙ্ক্ষার ঠিক বিপরীত, তা-ও স্পষ্ট।